Edit with WPS Office

Q. Discuss about the main features of Islamic education in medieval India .

ভারতের মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা বলতে প্রধানত মুসলিম আমলের শিক্ষাব্যবস্থাকে বোঝায় । মোটামুটিভাবে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত মুসলিম যুগ বিস্তৃত । ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের পর থেকে (১১৭৫ খ্রি .) । তিনি আজমীরে হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন । তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবুদ্দিনও বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন । কুতুবুদ্দিনের সুযোগ্য সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত করেন । এর ফলে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় । অবশ্য বিজয়ী মুসলমান শাসকগণ বিজিত রাজ্যগুলির মন্দির ধ্বংস করে বহু মসজিদ নির্মাণ করেন । এইসব মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম শিক্ষার প্রসার ঘটে । মুসলমান শাসকেরা বিদ্যানুরাগী ছিলেন । বিশেষত মুঘল বংশের রাজত্বকালে আকবর , জাহাঙ্গীর , শাহজাহান , ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি সম্রাট বহু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন ।

1. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives) : হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশের সামাজিক জীবনে কোন স্থিতিশীলতা ছিল না । তারা গৃহহীন যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াত । আরবদের মধ্যে অনেক উপজাতি ও যুথ ছিল । পরস্পরের মধ্যে সর্বদা কলহ ও মারামারি লেগে থাকত । পুরুষরা বহু বিবাহ করত । নিজ নিজ দেবতার প্রাধান্য নিয়ে প্রায়ই বিবাদ করত । সমাজে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ছিল । হজরত মহম্মদ এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করলেন সামাজিক স্থিতিশীলতা , সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও শান্তি স্থাপন । শিক্ষার পরবর্তী লক্ষ্য হল নৈতিক জীবনযাপনের শিক্ষা ও নিয়ম শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা । হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার মত ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক জীবন । হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের পথে শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে নির্দেশ করেছিলেন । শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আলোকের পথে উত্তরণ । শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল পয়গম্বরের বাণী , তাঁর নীতি ও কাজকে অনুধাবন ও অনুসরণ করা ও কোরাণের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা প্রভৃতি ।

2. পাঠ্যক্রম : মক্তবের পাঠ্যক্রম ছিল লিখন , পঠন , কোরাণের বয়াৎ মুখস্থ করা ইত্যাদি । কিছু কিছু গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল । কোরাণ ও ধর্মের নির্দেশ মেনে চলার শিক্ষাই ছিল মক্তবের প্রাথমিক পাঠ । মক্তবের উচ্চস্তরে পড়ান হত দরবেশ ও পীর পয়গম্বরদের জীবনী , ফারসী কাব্যগাথা , কিছু কিছু কাব্যাংশ প্রভৃতি । নামাজ পাঠ ও ধর্মীয় আচার ছিল মুসলমানদের ন্যূনতম শিক্ষা ।

মাদ্রাসার পাঠ্যবিষয় এক ছিল না । ভিন্ন ভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে নিতে পারত । মুঘল যুগে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম ছিল ব্যাপক । এখানে ব্যাকরণ , অলংকার , অর্থশাস্ত্র , সাহিত্য , আইন , বিজ্ঞান , চিকিৎসা , তর্কবিদ্যা , প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত । আকবরের সময়ে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের পরিধি আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল । আকবরের সময়ে পাঠক্রমের মধ্যে ছিল গণিত ,জ্যামিতি , হিসাব , কৃষি , জমি জরিপ , অর্থনীতি , রাজনীতি , ইতিহাস , প্রকৃতি বিজ্ঞান , জ্যোতির্বিজ্ঞান , দেহ বিজ্ঞান , নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি । সম্রাট আকবর , জাহাঙ্গীর ও শাজাহান চিত্র , ভাস্কর্য ও সঙ্গীত শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । কোন কোন মাদ্রাসায় ধর্মতত্ত্ব ও কোরাণের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত ।

3. শিক্ষণ পদ্ধতি (Methodology) : মক্তবের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল মৌখিক । পড়া মুখস্থ করানোই প্রধান কাজ ছিল । আকবর চেয়েছিলেন যান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে একটি গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে । তিনি পড়ার আগে হিন্দু শিক্ষা পদ্ধতির মত লেখবার পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছিলেন । তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ছাত্ররা যতটা সম্ভব স্বাধীনভাবে নিজেরাই শিখবে । শিক্ষকরা যথাসম্ভব কম সাহায্য করবেন । না বুঝে পড়া চলবে না । আকবর চেয়েছিলেন ছেলেরা যেন বুঝে মুখস্থ করে । মক্তবী পদ্ধতিতে মুখস্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত ।

Edit with WPS Office

4. শিক্ষক - শিক্ষার্থী সম্পর্ক : মুসলিম যুগে শিক্ষকদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ছিল । শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ ছিল । ফিরোজ তুঘলক তাঁর নতুন রাজধানী ফিরোজাবাদে যে ফিরোজশাহী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন , তাতে শিক্ষক ও ছাত্ররা একত্র বাস করত । ছাত্র শিক্ষকের যোগাযোগের মধ্যে যাতে প্রীতিপূর্ণ শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় , সেখানে সে ব্যবস্থা ছিল । আবাসিক বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক সান্নিধ্যের ফলে শিষ্যের জীবনধারার উপর শিক্ষকের প্রভাব প্রতিফলিত হত । সৎচরিত্র শিক্ষকের সাথে পিতাপুত্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর নৈতিক জীবন গড়া হয়েছিল ।

5. নারীশিক্ষা : মুসলমান আমলে নারীশিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি । প্রাথমিক শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য । রাজ পরিবার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে বিদ্যার সমাদর ছিল বলে মনে হয় । রাজ পরিবারের মহিলারা অনেক সময় রাজনীতিতে শিক্ষালাভ করতেন । সুলতানা রিজিয়া রাজকর্মে যথেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দেন । জাহাঙ্গীরের শাসন ব্যবস্থা নূরজাহানের উপর নির্ভরশীল ছিল । মোঘল রাজঅন্তঃপুরে কাব্য ও সাহিত্যের সমাদর ছিল । বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম হুমায়ুনের জীবনী ' হুমায়ুন নামা ' রচনা করেন । হুমায়ুনের ভাগিনী সালিমা সুলতানা ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন । শাজাহানের কন্যা জাহানারার আত্মজীবনী বিখ্যাত গ্রন্থ । ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবউন্নিসা বিদুষী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন । মুসলিম সমাজে অবরোধ প্রথা কঠোর হলেও মক্তবে মেয়েরা ৭ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত ।

6. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

মক্তব : মক্তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ মক্তবই ছিল মসজিদ সংলগ্ন খানকা (পিরের স্মৃতিসৌধ)-তেও স্কুল বসত। মক্তবে যেমন মৌলবিদের অভিভাবকত্বে আবাসিক ছাত্র নেওয়া হত, তেমনি দিবা ছাত্রও থাকত। মক্তবে কোনো বেতন নেওয়া হত না। মক্তবের জন্য কোনো দানের ব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ মক্তব জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত হত। তবে দরিদ্রের জন্য গ্রামীণ মক্তবে জিনিসের আকারে সামান্য বেতনের প্রথা ছিল। অনেক সময় মোল্লা, মৌলবি অথবা মওলারাই ছাত্রকে খাওয়া-পরা দিয়ে আশ্রয় দিতেন ও পড়াতেন।

(১) ভরতি: 4 বছর 4 মাস 4 দিন বয়সের সময় মক্তব অনুষ্ঠান তথা বিসমিল্লাহ্ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শুরু হত।

(২) পাঠক্রম: প্রধানত লেখা, পড়া, গণিত এবং কোরান পাঠের ব্যবস্থা ছিল। কলমা, কোরানের নির্দিষ্ট সুরা, কোরান নির্দেশিত বিধিবিধান, কিছু কিছু কাব্যাংশ, পির-পয়গম্বরের কাহিনি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফারসি ভাষা।

(৩) পাঠ-পদ্ধতি: মক্তবে সাধারণত কোনো লিখিত বই অনুসরণ করা হত না। লেখার আগে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। শ্রুতির মাধ্যমেই শিক্ষার্থী শিখত। হাতের লেখা ভালো করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

(৪) শৃঙ্খলা: মক্তবের শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষিত হত। স্কুল পালানো এবং অপরাধপ্রবণ ছাত্রদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। দৈহিক শাস্তি কখনো কখনো নির্দয়তার স্তরেও পৌঁছে যেত।

(৫) মূল্যায়ন: মক্তবে কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সারা বছর ধরেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হত।

(৬) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক: শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো। শিক্ষকের সেবা করা ছিল অবশ্য কর্তব্য।

মাদ্রাসা : ইসলামিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রকে মাদ্রাসা বলা হত । মাদ্রাসাগুলির বেশিরভাগই ছিল মসজিদ অথবা সমাধিস্থলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । সাধারণত একটি মাদ্রাসায় ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসনের জন্য

Edit with WPS Office

অনেক কামরা থাকত । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক একটি মাদ্রাসার এক - একটি বিশেষ বিষয়ে খ্যাতি ছিল । এই কারণে ছাত্ররা এক মাদ্রাসা থেকে অন্য মাদ্রাসায় যেত । মাদ্রাসাগুলির বেশিরভাগ ছিল শহরে অবস্থিত এবং আবাসিক । বিত্তশালীদের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত মাদ্রাসার শিক্ষা ছিল অবৈতনিক । বিত্তশালীরা অনেক বৃত্তির ব্যবস্থাও করতেন । শিক্ষকরা পেতেন ভাতা এবং ছাত্রেরা পেত বৃত্তি ।

(১) পাঠক্রম : মাদ্রাসার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যাকরণ , যুক্তিবিজ্ঞান , সাহিত্য , চিকিৎসা , ভূগোল , ইতিহাস , দর্শন , কলা , শিল্প এবং প্রয়োগবিদ্যা । এ ছাড়া শাসকদের মর্জি অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হত ।

(২) শিক্ষাপদ্ধতি : মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত মৌখিক । শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফারসি ভাষা । শিক্ষকগণ বক্তৃতা পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন । ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতি চালু ছিল , যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা অনুযায়ী শেখার সুযোগ পায় । মুখস্থ ছিল শিখনের প্রধান পদ্ধতি ।

(৩) শৃঙ্খলা : মক্তবের মতো মাদ্রাসায়ও কঠোর শৃঙ্খলা ছিল । ইসলামের নির্দেশানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় - নির্ঘণ্ট অনুসারে নামাজ পড়া , পড়াশোনা করা , ধর্মীয় এবং সামাজিক কর্তব্য পালনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে নিয়মানুবর্তিতা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার । অনৈতিক আচরণের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল ।

(৪) শিক্ষক - শিক্ষার্থী সম্পর্ক : মাদ্রাসাগুলি ছিল আবাসিক । আবাসিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সান্নিধ্যের ফলে শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষকের যথেষ্ট প্রভাব ছিল । শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী আচরণ করতেন । উভয়ের মধ্যে ছিল পিতা - পুত্রের সম্পর্ক । উপরিউক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও উলেমা আবাস ও গৃহস্থ বাড়িতে ইসলামীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল । কয়েকটি উল্লেযোগ্য মাদ্রাসা হল— গিয়াসুদ্দিন বলবন স্থাপিত মাদ্রাসা - ই নামিরিয়া , সুলতানা রাজিয়া স্থাপিত দিল্লির খুইজি কলেজ , মহম্মদ - বিন - তুঘলক স্থাপিত মাদ্রাসা , ফতেপুর সিক্রিতে আকবর স্থাপিত মাদ্রাসা ।

Q. Describe the educational contributions of Firoj Shah, Great Akbar and Aurangzeb.

A. শিক্ষাক্ষেত্রে ফিরোজ তুঘলকের অবদান :

ফিরোজ তুঘলক নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত । তাঁর আমলে ইসলামী শিক্ষার বেশ উন্নতি হয় । তিনি ছিলেন সুলতানী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সুলতান ।

(1) মহম্মদ বিন তুঘলকের পর ফিরোজ তুঘলক শিক্ষা সংক্রান্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারিত করেন । মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ , পুনর্বাসন এবং ভাতার জন্য তিনি রাজকীয় আদেশ জারী করেন ।

(২) জ্ঞানের চর্চাকে রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত না করে তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন । তিনি শাসন ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন ফিরোজাবাদ । জৌনপুরের মত আঞ্চলিক শহরকেন্দ্রও গড়ে তোলেন । তাঁর নূতন রাজধানী ফিরোজাবাদ শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় ফিরোজশাহী মাদ্রাসা । বিখ্যাত পন্ডিত জালালুদ্দীন রুমি এই মাদ্রাসায় ধর্মশাস্ত্র ও আইনে অধ্যাপনা করতেন । এই মাদ্রাসাটি একটি আবাসিক ও অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল । বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি মসজিদ ও অতিথিশালা সংযুক্ত ছিল । প্রতিটি ছাত্র , অধ্যাপক ও অতিথির জন্য দৈনিক ভাতা দেওয়া হত ।

Edit with WPS Office

(৩) পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি ফিরোজের শ্রদ্ধার নিদর্শন রয়েছে তাঁর প্রাসাদ পরিকল্পনায় । কথিত আছে তিনি দ্রাক্ষা প্রাসাদ , কাষ্ঠাসনের প্রাসাদ এবং আমদরবারের প্রাসাদ নামে তিনটি প্রাসাদ তৈরী করেন । দ্রাক্ষা প্রাসাদেই তিনি পন্ডিত ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতেন এবং পন্ডিতদের মজলিস বসাতেন ।

(৪) ঐতিহাসিকদের প্রতি তিনি নিজেই আকৃষ্ট ছিলেন । তৎকালীন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনী , সিরাজ আফিফ তাঁর দরবারের আনুকূল্য পেয়েছিলেন । সে সময়কার পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপযুক্ত ভাতা দেওয়ার জন্য তিনি সরকারী কানুন প্রবর্তন করেন । তিনি মুসলমান পণ্ডিত সভা আহ্বান করতেন ।

(৫) ফিরোজ তুঘলকের গঠনমূলক কাজের মধ্যে ছিল মক্তব ও মাদ্রাসা তৈরীর কাজ । বিভিন্ন বিবরণে ৩০ টি থেকে ৫০ টি মক্তব ও মাদ্রাসা তৈরীর কথা পাওয়া যায় । এর প্রতিটির জন্য তিনি অর্থ ও জমি দান করেন । ফিরোজ তুঘলক নিজেই বলেছেন , " আমি অনেক মসজিদ , মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস করেছি যেন পন্ডিতরা , বয়োবৃদ্ধরা এবং ধর্মপ্রাণরা ঈশ্বরের কথা নির্বিঘ্নে স্মরণ করতে পারেন । '

(৬) প্রাক্তন সুলতান ইলতুৎমিস ও আলাউদ্দীন কর্তৃক নির্মিত মাদ্রাসা ও মসজিদের সংস্কারের জন্য তাঁর রাজ আদেশ - প্রচারিত হয় । শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাকেই সাহায্য করেছেন ।

(৭) রাজনৈতিক কারণে নগরকোটের জ্বালামুখী মন্দির ধ্বংস করলেও সেখানে পাওয়া ১৩০০ পাণ্ডুলিপির অর্থোদ্ধার করতে তিনি পন্ডিত নিয়োগ করেন ।

(৮) যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে তিনি মীরাট থেকে দুটি অশোক স্তম্ভ অক্ষত অবস্থায় দিল্লীতে নিয়ে আসেন এবং নতুন করে স্থাপন করেন । আজও দিল্লীতে ফিরোজ শাহ কোটালায় ঐ স্তম্ভ দুটির একটি দেখতে পাওয়া যায় ।

(৯) একথা উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সময় থেকেই হিন্দুরা পারসিক ভাষা শিখবার চেষ্টা শুরু করেন এবং মুসলিম পন্ডিতরাও সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন ।

(১০) ফিরোজের গঠনমূলক কাজের ফলেই শিবালিক পাহাড়ে জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় । কারিগরির প্রতি তাঁর আকর্ষণের ফলশ্রুতি হল জলঘড়ি ।

(১১) সে সময় ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল বেশী । শোনা যায় তিনি ১৮,০০০ ক্রীতদাসের শিক্ষার ব্যয় বহন করতেন । ফিরোজ তুঘলক তাঁর ক্রীতদাসের জন্য পড়া , কোরাণ মুখস্থ করা এবং পুঁথি নকল করার মত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন । তাঁদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল । এদের মধ্যে ১২০০০ ক্রীতদাস সুপণ্ডিত , ব্যবসায়ী এবং শিল্প কারিগর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন ।

(১২) বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষার মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য কারিগরি বিদ্যার ইসলামী শিক্ষা সে যুগে বেশ উন্নত ছিল । তিনি বৃত্তিশিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন । এসব বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করবার জন্য তিনি কয়েকটি গ্রামের রাজস্ব পৃথক করে রেখেছিলেন । কয়েকটি অভিযান্ ছাড়া শান্তির এই সময়টিকে তিনি ব্যবহার করতে পেরেছেন শিক্ষা সংস্কৃতি এবং প্রজাহিতকর কাজে ।

B. শিক্ষাক্ষেত্রে আকবরের অবদান :

মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম অধ্যায় ছিল মহামতি আকবরের যুগ । তাঁর বিচিত্র প্রতিভা শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল । পুরাতনের বদলে তিনি নতুন সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন । অকৃপণ আনুকূল্য , অযাচিত বৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অজস্র দানের ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দিকে এসেছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণচাঞ্চল্য । ভারতীয় পুঁথির সবচেয়ে গৌরবময় যুগের সূচনা হয় বাদশাহ আকবরের আমল থেকে ।

Edit with WPS Office

(১) নিরক্ষরতা সম্বন্ধে মতবাদ : শোনা যায় আকবর নাকি লিখতে পড়তে জানতেন না । সম্রাটের নিরক্ষরতা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে । নিরক্ষর হলেও তিনি ছিলেন শিক্ষিতমনা ও বিদগ্ধ । তিনি ব্যুৎপন্ন , সত্যানুসন্ধানী ও জ্ঞান পিপাসু ছিলেন । তিনি সংস্কৃত মনের অধিকারী ছিলেন । জীবনে সংস্কৃতির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর চেতনা বিস্ময়োদ্দীপক । তাঁর সভায় বহু গুণী জ্ঞানীর সমাবেশ হয়েছিল । তিনি বই ভীষণ ভালবাসতেন । বইয়ের লেখা আর ছবির সৌন্দর্য তিনি হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করতেন । আর বই পড়িয়েদের বই পড়া ঘন্টার পর ঘন্টা শুনতেন । পারিশ্রমিক হিসাবে এই বই পড়িয়েদের পাতা পিছু মোটা ইনাম দিতেন ।

(২) বিশাল গ্রন্থাগার : আকবর ছিলেন এক বিশাল গ্রন্থাগারের মালিক । সেখান থেকে প্রতিদিন যে পুঁথি আসত তাই পড়ে তাঁকে শোনান হত । সম্রাটের সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ছিল তৎকালীন গর্বের বস্তু । ফৈজীর মৃত্যুর পরে তাঁর চার হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংযুক্ত হয় । গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে সজ্জিত ছিল । পুস্তক নির্বাচনে তিনি কোন বৈষম্য প্রদর্শন করেন নি ।

(৩) সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন : ফজল ‘ আকবরনামা ' নামে আকবরের জীবন চরিত ও ‘ আইন - ই - আকবরী ' নামে আকবরের শাসন প্রণালী সম্পর্কে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন । তাঁর সময় নিজামুদ্দিন ও বাদাউনি ফার্সী ভাষায় দুখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন । আবুল ফজলের ভাই ফৈজী সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ।

(৪) অনুবাদ : তিনি শুধু মুসলিম শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা নয় , হিন্দু শিক্ষা সংস্কৃতিকে বিশেষ ভাবে জানবার চেষ্টা করতেন । সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক তিনি ফারসী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন । সম্রাটের আদেশে মহাভারতের ফারসী অনুবাদ করা হয় ‘ রজম নামা ' নামে । রামায়ণ , মহাভারত , হরিবংশ , পঞ্চতন্ত্র , নলদময়ন্তী , লীলাবতী প্রভৃতির ফারসী সংস্করণ প্রস্তুত করা হয় । ইতিহাস , ভূগোল , জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তকও অনূদিত হয় ।

(৫) শিল্প , সঙ্গীত , চারুশিল্প , চিত্রকলার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা : সাহিত্য , ধর্ম , শিল্প , চারুশিল্প , চিত্রকলা প্রভৃতি সব কিছুতেই তাঁর সমান উৎসাহ ছিল । তাঁর আনুকূল্যে চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল । তাঁর নিজস্ব চিত্রশালায় হিন্দু ও মুসলিম চিত্রকরেরা সমভাবে আদৃত হয়েছিল । হস্তশিল্পকেও চারুশিল্পরূপে উৎসাহ দেওয়া হয় । শিল্পকলার চর্চা স্থাপত্যশিল্পকেও প্রভাবিত করে । সঙ্গীত কলার প্রতি সম্রাটের আনুকূল্য সর্বজনবিদিত । হরিদাস , রামদাস , তানসেন প্রভৃতি হিন্দু মুসলিম গুণীজনের সমাগমে রাজদরবার সঙ্গীত পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল । নানা বাদ্যযন্ত্র ঝংকৃত হল । প্রাচীন ভারতীয় রাগরাগিনীর হল নবজন্ম ।

(৬) স্ত্রীশিক্ষা : স্ত্রীশিক্ষাও আকবরের আনুকূল্য লাভ করেছিল । প্রাসাদের অন্দরমহলে ছিল জেনানা বিদ্যালয় ।

(৭) মাদ্রাসা স্থাপন : আকবর তাঁর প্রতিষ্ঠিত নূতন রাজধানী ফতেপুরসিক্রী , আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । সিরাজ থেকে অধসক এনে মাদ্রাসায় নিয়োগ করা হয় । তাঁর ধাত্রীমা মাহাম আনাগা একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন । দিল্লীর মাদ্রাসা আবাসিক ছিল না । বাহির থেকে শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশুনা করত । তিনি বহু নূতন মসজিদ ও কলেজ নির্মাণ করেন । সেলিম চিস্তির সমাধিস্থলে একটি সুবৃহৎ বিদ্যালয়ের চিহ্ন এখনও আছে । প্রসিদ্ধ পন্ডিতগণ স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাদান করতেন । মাদ্রাসায় হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ।

(৮) পাঠ্যক্রম : ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা ছিল । আকবরের সময় পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল গণিত , জ্যামিতি , হিসাব , জমি জরিপ , অর্থনীতি , রাষ্ট্রনীতি , ইতিহাস , বিজ্ঞান প্রকৃতিবিজ্ঞান , জ্যোতির্বিজ্ঞান , দেহবিজ্ঞান , ঈশ্বরতত্ত্ব , নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ।

C. শিক্ষায় ঔরঙ্গজেবের অবদান (১৬৫৬ - ১৭০৭ খৃঃ) :

Edit with WPS Office

শাজাহানের মৃত্যুর পরবর্তী সম্রাট হন ঔরঙ্গজেব । ঔরঙ্গজেব নিজে ছিলেন সুশিক্ষিত । তিনি কোরাণ , হাদিস মুখস্থ করেন । আরবী , ফার্সী , তুর্কি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল । তিনি কোরাণ নকল করে প্রতিলিপি বিক্রী করতেন । ধর্মতত্ত্বের অনেক বই তিনি সংযোজন করেন । ধর্মপুস্তকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করতেন । আইন শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল । তিনি উচ্চশিক্ষার অধিকারী হয়েছিলেন । আইন ও ব্যাকরণে তাঁর দক্ষতা ছিল ।

(ক) ঔরঙ্গজেব শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তিনি গোঁড়া ও ধর্মান্ত ছিলেন । তাই তিনি মুসলিম শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন । তিনি ইসলামী শিক্ষার জন্য দরাজ হাতে দান করেছেন । মুসলিম ছাত্রদের জন্য রাজকীর ভাণ্ডার থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন । তিনি ছাত্রবৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন ।

(খ) ঔরঙ্গজেব রাষ্ট্রনীতির সাথে শিক্ষানীতিকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন । তাই তিনি হিন্দু শিক্ষাকে আনুকূল্য প্রদর্শন করেননি বরং হিন্দু স্কুলগুলি ভেঙ্গে দিবার আদেশ দিয়েছিলেন । তিনি বারাণসী ও অন্যান্য হিন্দু তীর্থস্থান থেকে টোল , মন্দির প্রভৃতি ধ্বংস করে মসজিদ ও মাদ্রাসা , প্রতিষ্ঠার আদেশনামা জারি করেন ।

(গ) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে তিনি সাম্রাজ্যের মসজিদগুলি সংস্কার করেন । সাম্রাজ্যের নানা কেন্দ্রে তিনি অধ্যাপক , মৌলভী ও শিক্ষক নিয়োগ করেছেন । মসজিদে নিয়োগ করেন ইমাম । আমেদাবাদ , সুরাট ও পাটনার জন্য তিনি অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করেন । তিনি গুজরাটে বোহরা সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন ।

(ঘ) তিনি গুজরাটের একটি মাদ্রাসা বাড়ীর সংস্কার করেন । আমেদাবাদের একটি মাদ্রাসার জন্য জায়গীর দান করেন । লক্ষ্ণৌ - এর ওলন্দাজদের প্রতিষ্ঠিত গীর্জা অধিকার করে সেখানে তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ।

(ঙ) তাঁর সময়ে শিয়ালকোট ছিল বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র । বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা আবদুল্লা ছিলেন এখানকার শিক্ষক ।

(চ) ধর্মীয় উন্মাদনা থাকা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেব সে যুগের খ্যাত হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করতেন এবং শিল্প বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন ।

(ছ) সাম্রাজ্যের সর্বত্র মুসলিম শিক্ষার্থীদের বিনা ব্যয়ে পাঠ চর্চার জন্য ঔরঙ্গজেব প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের রাষ্ট্রীয় সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন ।

(জ) ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে ফতোয়া - ই - আলমগীরি ’ নামে বিখ্যাত মুসলিম আইন গ্রন্থ সংকলিত হয় ।

(ঝ) রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তিনি রাজপুত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন । রাজপুত্রগণ উপযুক্ত শিক্ষকের কাছ থেকে সামরিক শিক্ষা , আইনশাস্ত্র , ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত ।

(ঞ) শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন নূতন পদ্ধতির কথা ঔরঙ্গজেব চিন্তা করেছিলেন । শিক্ষার অগ্রগতির দ্রুততার উপর নজর ছিল । প্রকৃত শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম যে প্রশস্ত হওয়া দরকার সেকথা তিনি নিজে ব্যক্ত করেছেন । তিনি শিক্ষার্থীর মানসিকতাকে উন্নত করার কথা বলেছেন । তিনি এমন প্রয়োজনীয় বাস্তবধর্মী শিক্ষার কথা বলেছেন যা জীবনযুদ্ধে সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করে ।

সমালোচনা শিক্ষাচিন্তায় ও শিক্ষা পরিকল্পনায় ঔরঙ্গজেব চেয়েছিলেন মুসলিম ধর্মনীতি ও শিক্ষানীতির বিস্তার । ফলে হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা অবহেলিত হল । এই অনুদার নীতি জাতীয় জীবনে এনেছিল অবক্ষয় । কিন্তু ঔরঙ্গজেবের শিক্ষা পরিকল্পনায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান , চরিত্র গঠন , আন্তর্জাতিক জ্ঞানলাভ , প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । শিক্ষার অগ্রগতির দ্রুততার উপর ঔরঙ্গজেবের গভীর দৃষ্টি ছিল ।

Q. Discuss the recommendations of the Radha Krishnan or University Commission with regard to reform of University education.

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে এক কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশনের নাম হয় রাধাকৃষ্ণন কমিশন। কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ড. নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (সম্পাদক), ড. তারাচাঁদ, ড. জাকীর হোসেন, ড. লক্ষণ স্বামী মুদালিয়র, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. জন টিগার্ট এবং ড. এ. ই. মার্গানের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য (Aims of University Education) :

স্বাধীনতালাভের পর উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এই অবস্থার কথা মনে রেখে রাধাকৃষ্ণন কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যেসব উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন সেগুলি হল:

(১) নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন (To Create leadership): সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে সমর্থ ব্যক্তিদের গড়ে তোলাই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। দেশের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কারিগর প্রভৃতি।

(২) চারিত্রিক উন্নতিসাধন (To develop character): কমিশন বলেছেন, আমরা একটা সভ্যতা গড়ে তুলতে চাই, একটা ফ্যাক্টরি বা কারখানা নয়। একটা সভ্যতা নির্ভর করে ব্যক্তির চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর। শিক্ষা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাবে, মুক্তি ছাড়া অন্যসব অনুশাসন থেকে মুক্তি দেবে । সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মূল্যবোধ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) কৃষ্টির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিসাধন (Transmission of ethical heritage) কমিশনের মতে, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির বৌদ্ধিক ও নৈতিক জ্ঞান সঞ্চারিত করাই হবে উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ।

(৪) গণতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার (To develop democratic values): গণতন্ত্রের ভিত্তি হল ব্যক্তি-স্বাধীনতা। কিন্তু ব্যক্তির উন্নতি নির্ভর করে সমাজের উন্নতির উপর। সুতরাং সামাজিক কল্যাণ হবে শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য।

(৫) জ্ঞানের রাজ্যে অভিযান (Intellectual adventure): শুধু অতীতের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকলে আমাদের চলবে না। আগামী দিনের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে তুলতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানরাজ্যে দুঃসাহসিক অভিযান (Intellectual adventure) চালাতে হবে।

(৬) প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার (Utilisation of the natural and human resources): জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য প্রাকৃতিক এবং মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য।

পাঠ্যক্রম (Curriculum):

কমিশন সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা বলেছেন। ছাত্ররা বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাহায্যে বিশেষ কর্মক্ষেত্রের জন্য তৈরি হবে। অবশ্য অতি বিশেষীকরণ সমর্থনযোগ্য নয়।

(ক) সাধারণ শিক্ষা (General Education): কোনো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ১২ বছর শিক্ষালাভ করার পর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান (Arts and Science) শাখায় ভর্তি হতে পারবে। পাস ও অনার্সের তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু করা হবে। পাস কোর্সের ছাত্ররা দু'বছর ও অনার্স ছাত্ররা এক বছর পর মাস্টার্স ডিগ্রীলাভ করবে।

(খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Professional Education): কমিশন পেশাগত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আইন এবং চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যক্রম কমিশন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এইসব বিষয়গুলি শিক্ষা দেবার জন্য যোগ্য শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দিয়ে নিযুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(১) কৃষি: শিক্ষার সর্বস্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। গ্রামীণ পরিবেশে কৃষি-কলেজ (Agricultural College) এবং গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) স্থাপন করতে হবে। কৃষির উন্নতির জন্য বহু গবেষণাগার ও কষিখামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(২) বাণিজ্য: বাণিজ্যের ছাত্রদের বিভিন্ন ফার্মে হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ দিতে হবে। বি.কম, পাসের পর ছাত্রদের বাণিজ্যের বিশেষ কতকগুলি শাখায় শিক্ষা নিতে হবে। এম. কম, ছাত্রদের শিক্ষা পুঁথিগত না হয়ে প্রধানত ব্যবহারিক হবে।

(৩) শিক্ষাতত্ত্ব: শিক্ষাবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে। স্কুলে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অধিক সময় দিতে হবে। ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার জন্য যাদের বিদ্যালয়ে পড়াবার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাদের নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষায় তাত্ত্বিক বিষয়গুলি নমনীয় (flexible) হবে এবং স্থানীয় পরিস্থিতির অনুকূল হবে।

(৪) ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি : ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। যেসব প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান রয়েছে সেগুলির উন্নতিসাধন করতে হবে এবং উন্নত ধরনের নতুন প্রতিষ্ঠান আরও স্থাপন করতে হবে।

(৫) আইন: আইন বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স তিন বছরের হবে। আইন শাখায় ভর্তি হতে হলে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স অবশ্যই পাস করতে হবে। হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য কোন উকিলের অধীনে এক বছর কাজ করতে হবে। ।

(৬) চিকিৎসা বিদ্যা: মেডিকেল কলেজগুলিতে একশ জনের বেশি ছাত্র ভর্তি করা হবে না এবং প্রতি ছাত্রের জন্য কমপক্ষে দশ জন রোগীর শয্যা নির্দিষ্ট থাকবে। গ্রামীণ কেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় ভেষজশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতকোত্তর স্তরে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ও নার্সিংকে গুরুত্ব দিতে হবে। নির্বাচিত কয়েকটি কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠের ব্যবস্থা করা উচিৎ।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো (Structure of Rural University):

ভারত স্বাধীনতা লাভ করবার পর ভারতের হাজার হাজার গ্রামের বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং তা থেকেই গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি সৃষ্টি হয়। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন বুঝেছিলেন, যে সব ছেলেমেয়ে গ্রামে বাস করে এবং শহরে এসে পড়ার সুযোগ হয় না, তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় নামে এক নূতন শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামের মানুষ যাতে গ্রামে থেকেই নিম্নস্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালযের স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন রিপোর্টের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সর্বাত্মক নূতন চেতনা ঘোষণা করা। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব অনুভব করে শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রাম জীবনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কথা বলেছেন।

তাই এই কমিশন গ্রাম জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার সুপারিশ করেছেন। রাধাকৃষ্ণণ

কমিশন সুপারিশ করেন যে, ভারতের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অগণিত গ্রামবাসীর প্রয়োজন সামনে রেখে উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য এক কর্মসূচী গ্রহণ করবে। গ্রাম জীবনের বিশেষ চাহিদা ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে। এগুলি থেকে শিক্ষালাভ করে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী বেরোবে, তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে ভারতে মানুষের জীবনের সংস্কার সাধন ও উন্নয়ন করা।

এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার রূপ প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে গ্রামীণ উচ্চবিদ্যালয়রূপে গ্রহণ করা হয়। কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে থাকবে একটি গ্রামীণ কলেজ। কয়েকটি কলেজকে কেন্দ্র করে থাকবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। কমিশন গ্রামের উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি স্বতন্ত্রভারে পরিকল্পিত হওয়া উচিত বলে মনে করেছেন। যেমন শহরের উচ্চশিক্ষায় প্রধান বিষয় হবে কারিগরি, বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রশিল্পমূলক প্রভৃতির শিক্ষা। কিন্তু গ্রামে উচ্চশিক্ষায় থাকবে গ্রামোন্নয়ন, জন শিক্ষার বিস্তার, কৃষি, সামাজিক সংহতি প্রভৃতি সম্পর্কিত শিক্ষার বিষয়গুলি। কমিশনের মতে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়, পাঠ্যক্রম প্রভৃতি সমস্তই গ্রামীণ জীবনের পরিবেশ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পিত হবে।

সুতরাং গ্রামীণ কাঠামোয় থাকবে-

১) ৭ কিংবা ৮ বছর ব্যাপী নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা।

২) তিন কিংবা চার বছরের উচ্চ বুনিয়াদি ও মাধ্যমিক শিক্ষা।

৩) তিন বছরের গ্রামীণ কলেজ এবং

৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার জন্য একটি জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ কমিশনের নির্দেশ আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানে গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের নির্দেশ দেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে ১৪টি গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এগুলির অন্যতম হল বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশনের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং যুগোপযোগী, কিন্তু কমিশন এ সম্পর্কে কোন সঠিক বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা দেন নি। তার ফলে গ্রামীণ জীবনের উপযোগী শিক্ষা প্রবর্তনের যে স্বপ্ন কমিশন দেখেছিলেন, সেটিকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়নি। কারণ কার্য উপযোগী উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব ছিল।

Q. Discuss the recommendations of the Mudaliar or Secondary education Commission with regard to reform of University education.

১৯৫১ খ্রি. কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (The Central Advisory Board of Education) এ দেশের প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান করার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ভারত সরকার ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর একটি কমিশন (The Secondary Education Commission, 1952) গঠন করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন, ড. এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন মুদালিয়র কমিশন নামে পরিচিত। নয়জন সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-জে. খ্রিস্টি, কে. আর. উইলিয়ম, ড. কে. এল. শ্রীমালি, এম. টি. ব্যাস, অনাথ বসু প্রভৃতি।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives):

কমিশন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে মাধ্যমিক শিক্ষার কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করেছিলেন।

ক) প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার মধ্যবর্তী অংশ হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তররূপে পরিগণিত করা শিক্ষার একটি লক্ষ্য।

খ) দ্বিতীয় লক্ষ্য হল তরুণ- তরুণীদের দৃঢ় চরিত্র সৃষ্টির (Training of Character) উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা, যাতে তারা ভবিষ্যতে সমাজ জীবনে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

গ) তৃতীয় লক্ষ্য হল এই শিক্ষার সাহায্যে তরুণ তরুণীরা তাদের জীবিকা অর্জনের উপযোগী যোগ্যতা অর্জন (Vocational efficiency) করতে পারবে এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধশালী ভারত গঠনে তারা নিজেদের নিযুক্ত করতে পারবে।

ঘ) উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন (Personality) চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করা এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

ঙ) এই শিক্ষার সাহায্যে তারা নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প সংক্রান্ত যোগ্যতা ও রুচি বর্ধিত করতে পারবে এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন (Cultural) নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

চ) এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যার ফলে উদার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির পথে যা কিছু অন্তরায় তাকে যেন সে অতিক্রম করতে পারে।

মাধ্যমিক নতুন কাঠামো (New Organisational Pattern):

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ (complete stage by itself)। এই স্তরে শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কার-সাধনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছেন:

(১) নতুন কাঠামো অনুসারে ৪/৫ বছরের প্রাথমিক কিংবা নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি স্তরে বিভক্ত হবে-

(ক) নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদি (Lower Secondary or Senior Basic)। শিক্ষার কাল হবে ৩ বছর।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (Higher Secondary)। শিক্ষার কাল হবে ৩ বছর।

(I+II+III+ IV + V) = ৫ বছরের প্রাথমিক বা জুনিয়ার বেসিক

(VI + VII + VIII) = ৩ বছরের সিনিয়ার বেসিক বা নিম্ন মাধ্যমিক

(IX + X + XI) = ৩ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক

মোট = ১১ বছর

(২) অন্তর্বর্তীকালে প্রচলিত দশম শ্রেণিভুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ও একাদশ শ্রেণিভুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি একইসঙ্গে বহাল থাকবে।

(৩) ইন্টারমিডিয়েট কোর্স বিলোপ করে ইন্টারমিডিয়েট স্তরের এক বছর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হবে, এবং শেষ বছরটি যুক্ত হবে ডিগ্রী কোর্সের সঙ্গে।

(৪) ডিগ্রী কোর্সের সময়কাল হবে তিন বছরের।

(৫) দশম শ্রেণিভুক্ত বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য এক বছরের প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় (Pre-University) শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) বৃত্তিশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কলেজগুলিতে এক বছরের প্রাক্-বৃত্তিমূলক কোর্স (Pre-professional Course) চালু করতে হবে।

(৭) শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও রুচি অনুসারে শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় (Multipurpose Schools) স্থাপন করতে হবে।

পাঠ্যক্রম (Curriculum) or Seven stream of curriculum :

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কমিশনের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন, তাতে ভবিষ্যতে দু প্রকারের মধ্য বিদ্যালয় প্রচলিত থাকবে। বর্তমান উচ্চবিদ্যালয়গুলি এর মধ্যে ধরলে মোট তিন প্রকারের (নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়) দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান থাকবে।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ১১-১৬ বছরের বালক-বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাকাল যথাক্রমে তিন বছর ও চার বছর হবে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা করা হবে সেগুলি হল যথা- ১) ভাষা, ২) সামাজিক শিক্ষা, ৩) সাধারণ বিজ্ঞান, ৪) গণিত, ৫) কলা ও সঙ্গীত, ৬) শিল্প ও ৭) শরীর চর্চা।

উচ্চ বিদ্যালয় বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর রুচি, যোগ্যতা, প্রবণতা অনুযায়ী বহুমুখী বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয় হবে 'মূল বিষয়' এবং কয়েকটি হবে ঐচ্ছিক বিষয়। মুল বিষয়গুলি সকলকে গ্রহণ করতে হবে এবং ঐচ্ছিক বিষয়গুলি নির্বাচন করতে হবে ছাত্রদের ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী। কমিশন উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য-বিষয় নির্ধারিত করেছেন।

মূল বিষয়:

ক) ভাষা : ১) মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা অথবা প্রাচীন ভাষার সম্মিলিত বিষয় ২) নিম্নলিখিত ভাষাগুলির একটি হিন্দী, ইংরাজী, উচ্চতর ইংরাজী, আধুনিক ভারতীয় ভাষা, আধুনিক বৈদেশিক ভাষা ও প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত ও পালি)।

খ) সামাজিক শিক্ষা গ) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত, ঘ) একটি শিল্প।

ঐচ্ছিক বিষয়:

নিম্নলিখিত বিভাগগুলির যে কোন একটি হতে তিনটি বিষয়:

প্রথম বিভাগ - প্রচলিত কলা (Humanities) : ক) প্রাচীন ভাষা বা অন্য একটি ভাষা, খ) ইতিহাস, গ) ভূগোল, ঘ) অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান, ঙ) মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র, চ) গণিত, ছ) সংগীত, জ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান।

দ্বিতীয় বিভাগ (বিজ্ঞান বিষয়) : ক) পদার্থ বিদ্যা, খ) রসায়নবিদ্যা, গ) জীববিদ্যা, ঘ) ভূগোল, ঙ) গণিত, চ) শারীর বৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

তৃতীয় বিভাগ (কারিগরী Technical): ক) ব্যবহারিক গণিত ও জ্যামিতিক অঙ্কন, খ) ব্যবহারিক বিজ্ঞান, গ) যন্ত্র বিজ্ঞান ঘ) তাড়িত বিজ্ঞান

চতুর্থ বিভাগ (বাণিজ্যিক Commercial): ক) বাণিজ্যিক কৃত (Commercial practice) গাণনিক্য (Book keeping), বাণিজ্যিক ভূগোল, ঘ) শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং।

পঞ্চম বিভাগ (কৃষি বিভাগ): ক) সাধারণ কৃষিবিদ্যা, খ) পশুপালন, গ) উদ্যানরক্ষা ও নির্মাণ, ঘ) কৃষি বিষয়ক রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা।

ষষ্ঠ বিভাগ (চারুকলা): ক) কলাবিদ্যার ইতিহাস, খ) অঙ্কণ ও ডিজাইন শিক্ষা, গ) চিত্রকলা, - ঙ) সংগীত, চ) নৃত্য, ঘ) মডেলিং

সপ্তম বিভাগ (গার্হস্থ্য বিভাগ): ক) গার্হস্থ্য অর্থনীতি, খ) পুষ্টি ও রঞ্জন বিদ্যা, গ) মাতৃত্ব বিজ্ঞান ও শিশুপালন, ঘ) সংসার পরিচালনা ও শুশ্রূষা।

অতিরিক্ত বিষয় নির্বাচন : উপরোক্ত বিভাগের বিষয়গুলি হতে আরও একটি বিষয় শিক্ষার্থী অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

Q. Discuss the recommendations regarding the School Education made by the Indian Education or Kothari Commission 1964-66.

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই জুলাই ভারত সরকারের এক প্রস্তাবে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করা এবং ভারত সরকারকে শিক্ষার সর্বস্তরে উন্নয়ন ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া শিক্ষা কমিশন ১৭ জন সভ্য নিয়ে গঠিত হয়। ডি. এস. কোঠারী কমিশনের সভাপতি হন। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন কোঠারী কমিশন নামে পরিচিত। লে.পি. নায়েক এই কমিশনের সভা সম্পাদক ছিলেন। কমিশনের অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে আর.এ. গোপালস্বামী, পি.এন. কৃপাল, এম. ভি. মাথুর, ড. বি. পি. পাল, কে. জি. সাঈদেন, ড. টি. সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সাংগঠনিক কাঠামো (Structure):

প্রাথমিক শিক্ষা - মুদালিয়র কমিশনের শিক্ষা কাঠামোকে কোঠারী কমিশন পুনর্বিন্যাস করেন। এই কমিশন শিক্ষা কাঠামোকে কয়েকটি স্তরে বিন্যাস করে শিক্ষায় নূতন কাঠামো করার উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল।

(১) ১- ৩ বছর বয়সের শিশুর প্রাক্ বিদ্যালয়ী শিক্ষা (Pre School Education)- শিশুর জীবনে নার্সারী ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা এই সময়ে গৃহীত হবে।

(২) ৩৫ বছর শিশুদের প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর।

(৩) ৫ - ৬ বছর বয়স শিশুদের শিশু শ্রেণীর অন্তর্গত করতে হবে।

(৪) ৬ ৮ বছর বয়স অবধি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার কাল। এই প্রাথমিক শিক্ষায় দুটি স্তর থাকবে। (ক) ৪ বা ৫ বছরের নিম্ন প্রাথমিক (Lower Primary) এবং (খ) ২ বা ৩ বছরের উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা (Higher Primary)

স্তর। নিম্ন প্রাথমিক স্তর অবৈতনিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হবে।

(৫) প্রাথমিক স্তরের পরে ২-৩ বছরের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা: মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেও কোঠারী কমিশন দুটি ভাগের সুপারিশ করেন। যথা- (ক) নিম্ন মাধ্যমিক ও খ) উচ্চমাধ্যমিক স্তর। ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিও দু-রকম হবে, একটি হবে দশম শ্রেণী যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও অপরটি হবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর বিদ্যালয়।

প্রাথমিক স্তর সাত বছর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকলে তিন বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে, আর আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হলে দু-বছরের নিম্ন মাধ্যমিক স্তর প্রবর্তিত হবে।

ভাষানীতি (Language Policy):

উপযুক্ত ভাষানীতি জাতীয় সংহতির বিশেষ সহায়ক হবে। এইজন্য কমিশনের সুপারিশ হল:

(১) স্কুল ও কলেজ স্তরে শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার দাবি অগ্রগণ্য। আরার স্কুল ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম একইরকম হওয়া দরকার। আগামী ১০ বছরের মধ্যে যাতে এই সুপারিশ কার্যকরী হয় সেজন্য U.G.C. এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সচেষ্ট হতে হবে।

(২) আঞ্চলিক ভাষায়, বিশেষত বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে যাতে গ্রন্থ তৈরি হয় তার চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে U.G.C. বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করবে।

(৩) সর্বভারতীয় শিক্ষাসংস্থাগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি থাকবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এখানেও হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে হবে।

(৪) স্কুল স্তর থেকেই ইংরেজি শেখাতে হবে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য অন্যান্য বিদেশী ভাষা, বিশেষত রাশিয়ান ভাষা শেখার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা দরকার।

(৫) স্কুল ও বিদ্যালয় স্তরে পৃথিবীর কয়েকটি প্রয়োজনীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার।

(৬) উচ্চশিক্ষার ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষার ভাষা হিসাবে (link language) ইংরেজি বর্তমান থাকবে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য ইংরেজি কখনও সংযোগরক্ষার ভাষা হতে পারে না।

(৭) হিন্দী সরকারি ভাষা এবং অধিকাংশ লোকের যোগাযোগের ভাষা। তাই অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করা দরকার।

(৮) আন্তঃ প্রাদেশিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য স্কুল-কলেজে, আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতা (Education and Productivity) :

বর্তমানে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে পৃথিবীর সর্বত্র উৎপাদনশীলতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট রয়েছে এবং মানবসম্পদেরও অভাব নেই। সুতরাং এই প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য মানবশক্তির উপযুক্ত পরিকল্পনার (Manpower planning) সবিশেষ প্রয়োজন। বৃত্তিমুখী শিক্ষার দ্বারা মানুষের যত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, দেশের উৎপাদনও তত বাড়বে এবং সমাজ ততই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষ একটি উন্নতিশীল দেশ। এর নানাবিধ সমস্যার মধ্যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব অন্যতম। এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে নিছক কেতাবী শিক্ষায় কাজ হবে না। তরুণদের শিক্ষাকে আজ বৃত্তিমুখী করে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক করতে হবে।

গান্ধীজি বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করতে চেয়েছেন। একটি হস্তশিল্পকে ভিত্তি করে শিক্ষাদান করার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রীনিকেতনে নানারূপ বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। স্বাধীনতার পরে কোঠারী কমিশন (1954-66) উৎপাদনশীলতা ও বৃত্তিশিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপে করেছেন।

বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education):

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কমিশনের নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) প্রতিটি ৫-১১ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(২) ১১-১৪ বছরের শিক্ষার্থীদের যারা শিক্ষাগ্রহণ করেনি বা শিক্ষা শেষ হবার আগেই স্কুল ত্যাগ করেছে, তাদের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৩) ১৫-৩০ বছরের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য আংশিক সময়ের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা সদ্য সদ্য লেখাপড়া শিখেছে, তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। যারা আংশিক সময়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, তাদের জন্য ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব ছাত্ররা মাঝে মাঝে শিক্ষদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। স্কুলগুলিতে পাঠাগার বাড়াতে হবে। লেখাপড়ার মান বাড়াতে পাঠাগারের গুরুত্ব খুবই।

Curriculum:

নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম: (১) একটি ভাষা (মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা), (২) গণিত, (৩) পরিবেশ পরিচিতি, (৪) সৃজনশীল কাজ, (৫) কর্ম অভিজ্ঞতা এবং সমাজসেবা ও (৬) স্বাস্থ্য শিক্ষা।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম (পঞ্চম, ষষ্ঠ- সপ্তম, অষ্টম): (১) দুটি ভাষা-মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এবং হিন্দি বা ইংরেজি ঐচ্ছিক হিসাবে তৃতীয় ভাষা, (২) গণিত, (৩) বিজ্ঞান (ভৌতবিজ্ঞান/ জীবন বিজ্ঞান), (৪) সমাজবিদ্যা (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান), (৫) চারুশিল্প, (৬) কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবা, (৭) শারীরশিক্ষা, (৮) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা, (৯) কলা ও (১০) হস্তশিল্প-হস্তশিল্পকে পাঠক্রমে কর্ম-অভিজ্ঞতা হিসাবে গণ্য করা হবে। খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষাকে উপযুক্ত স্থান দেওয়া হবে এবং সময়তালিকায় এর জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ড দেওয়া হবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম: (১) ৩টি ভাষা-অহিন্দি ভাষা অঞ্চলে-(ক) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, (খ) হিন্দি ও (গ) ইংরেজি। হিন্দি ভাষা অঞ্চলে-(ক) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা (হিন্দি বা ইংরেজি), (খ) হিন্দি (যদি প্রথম ভাষা ইংরেজি হয়, বা ইংরেজি (যদি প্রথম ভাষা হিন্দি হয়)। (২) গণিত, (৩) বিজ্ঞান (ভৌতবিজ্ঞান ও জীবন বিজ্ঞান), (৪) ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, (৫) চারুশিল্প, (৬) কর্মঅভিজ্ঞতা, (৭) সমাজসেবা, (৮) শারীরশিক্ষা ও (৯) আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম (একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণি): (১) যে-কোনো দুটি ভাষা-আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের, বিদেশি ভাষাসমূহের এবং প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে যে-কোনো দুটি। (২) নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি

থেকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে যে-কোনো ৩টি বিষয়-একটি অতিরিক্ত ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, চারুশিল্প, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। (৩) কর্ম-অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবা। (৪) শারীরশিক্ষা। (৫) চারু শিল্প বা হস্ত শিল্প। (৬) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম থাকবে না। তবে গৃহবিজ্ঞান, সংগীত, কলা প্রভৃতি হবে ঐচ্ছিক বিষয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ:

কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থিত করেছেন এবং পাঠক্রমও বিন্যাস করেছেন। কমিশনের রিপোর্টে পরস্পর সংযুক্ত দুটি পর্যায়ে (নিম্ন মাধ্যমিক VIII থেকে X [অষ্টম/ নবম/দশম] উচ্চমাধ্যমিক একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণি)।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক নাগরিকতার জন্য শক্তিশালী সাধারণ শিক্ষা, যার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী কমিশন কিংবা উচ্চতর শিক্ষায় কিংবা নানাবিধ বৃত্তি ও কারিগরির বিশেষ শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর:

(১) উচ্চপ্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলি নিম্নমাধ্যমিক স্তরে আরও গভীরভাবে পড়তে হবে।

(২) পাঠক্রমে থাকবে ৩ টি ভাষা-মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় অথবা সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা বা অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

(৩) গণিত ও বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা এবং ভূমিবিজ্ঞান হবে আবশ্যিক পাঠ্য।

(৪) ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান আলাদা আলাদাভাবে পড়ানো হবে।

(৫) শারীরশিক্ষা, কলা ও নৈতিক শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৬) সমাজসেবার জন্য এই স্তরে উন্নয়নমূলক কর্ম বাধ্যতামূলক।

উচ্চমাধ্যমিক স্তর:

(১) পূর্বের সাধারণধর্মী শিক্ষাকে দৃঢ়তর ও প্রসারিত করা এবং ঐচ্ছিক পাঠের মাধ্যমে বিশেষীকরণের সূচনা করাই হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের দু-বছরের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(২) এই স্তরের পাঠক্রমে থাকবে ২টি ভাষা ও ৩টি ঐচ্ছিক বিষয়।

(৩) ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকবে। মিশ্র বিষয় নেওয়া যাবে।

(৪) কৃষিবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে স্থান দিতে হবে।

(৫) মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম থাকবে না। তবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সংগীত, কলা প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় পাঠের সুযোগ থাকবে।

(৬) সমাজসেবার জন্য থাকবে শ্রম ও সমাজসেবা শিবির।

(৭) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ২ বছরের শিক্ষান্তে বহিঃপরীক্ষা হবে। শংসাপত্র দেবে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।